Vol. 44 | No. 2 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ভাষা ও সমাজ : একটি অখণ্ড সমাজভাষিক অবলোকন

Volume	44
Issue	2
Year	2001
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সাখাওয়াৎ আনসারী
Published online	February 1, 2001
DOI	10.62328/sp.v44i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i2.3
Pages	৫১-৬৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

ভাষা ও সমাজ : একটি অখণ্ড সমাজ[illegible]ন

Check for updates

সাখাওয়াৎ আনসারী *

যে পরম সম্পদ মানুষের সঙ্গে অন্য সকল প্রাণীর ভেদরূপ সৃষ্টির প্রধান নিয়ামক— তা ভাষা। এই ভাষা যে শুধু তাকে অন্য প্রাণী থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে তা-ই নয়, এটি তাকে অন্য প্রাণীর ওপরে দুর্লভ শ্রেষ্ঠত্বও দান করেছে। 'ভাষিক বৈশিষ্ট্য' মানুষ অর্জন করেছে ক্রম বিবর্তনের ধারায়, অপর একটি বিশিষ্ট অন্তর্সত্তা 'মন'-এর উপজাত হিশেবে। ডেভিড ক্রিস্টাল যথার্থই বলেছেন:

> শব্দ-ক্রম এবং বাক্য-পারম্পর্যের মতো ভাষার যথাযথ বৈশিষ্ট্যসমূহ এমন মাধ্যম সৃষ্টি করে যার মধ্য দিয়ে আমাদের সম্পর্কিত ভাবনাগুলো উপস্থাপিত এবং বিন্যস্ত হয়।[১]

ভাষাবিজ্ঞানের কাজ হলো উল্লেখিত 'ভাষিক বৈশিষ্ট্য' অনুসন্ধান করা, তার বিশ্লেষণ-বর্ণনা করা এবং তাকে সূত্রাবদ্ধ পারম্পর্যে উপস্থাপন করা। এই ভাষিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রায় সর্বত্রই সংগঠন নির্ভর হলেও তা সুদীর্ঘকাল ছিল ভাষা আলোচনায় অনুপস্থিত। ভাষা চর্চার ইতিহাসই তার সাক্ষ্য।

প্রাচীন কাল থেকে শুরু ক'রে উনিশ শতক পর্যন্ত ছিল 'প্রথাগত ব্যাকরণ'-এর আধিপত্য। উনিশ শতকের সূচনালগ্নেই এ আধিপত্যে ভাঙন ধরতে থাকে যখন দুটো প্রশ্নের উত্তর জানতে মানুষ আগ্রহী হয়ে ওঠে। প্রশ্ন দুটো সরল— ১. পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষাগুলোর উৎস কী?, এবং ২. পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা কত? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে 'কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান' এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জন্ম হয় 'তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান'-এর। কিন্তু সস্যুর, সাপির, ব্লুমফিল্ড, ফার্থ, হকেটের মতো ভাষাবিজ্ঞানীর আবির্ভাবে ভাষাবিজ্ঞানের উল্লেখিত দুটো ধারা 'সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান'-এর বিপুল বিস্তৃতির কাছে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। বিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকে শুরু হয় সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রবল পথ-চলা। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে ভাষাকে উপস্থাপন করা হয় সমকালিক স্তরে: অভ্যন্তরীণ গঠন কাঠামোর পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। এ বর্ণনা গ'ড়ে ওঠে ধ্বনি সংশ্রয় এবং ভাবকে ভিত্তি ক'রে। গ্লিসন-এর মূল্যায়নে তা চমৎকার ধরা পড়েছে :

> এই সংগঠন কী? ভাষা দু'ধরনের উপাদান নিয়ে কাজ করে। এর একটি হলো ধ্বনি। মানুষের বাগ্‌যন্ত্রসমূহ সৃষ্টি করতে পারে এমন প্রায় সকল আওয়াজ কোনো না কোনো ভাষায় কোনো না কোনোভাবে ব্যবহৃত হয়। অন্যটি হলো ধারণা, সামাজিক প্রতিবেশ, অর্থ— পুরো বিষয়টি কোনো প্রকৃত গ্রহণযোগ্য ইংরেজি অভিধায় অপ্রকাশযোগ্য— মানুষের অস্তিত্ব নির্দেশক ঘটনা বা অলীক কল্পনা, সেই বিষয় যাতে মানুষ সাড়া দেয় এবং সঙ্গীদের চিন্তা জ্ঞাপনে সচেষ্ট করে। ভাষাবিজ্ঞানীদের বিবেচনায় এই দুইকে সুবিধাজনকভাবে *অভিব্যক্তি* এবং *আধেয়* হিশেবে অভিহিত করা যেতে পারে।[২]

---

* সহকারী অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

'অভিব্যক্তি' (Expresson) এবং 'আধেয়' (Content)— এ দুয়ের যুগপৎ বর্ণনাই হলো 'সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান', নামান্তরে 'আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান'-এর উপজীব্য।

বিশ শতকের প্রায় সূচনালগ্ন থেকে 'অভিব্যক্তি' এবং 'আধেয়' বর্ণনা ভাষাবিজ্ঞানের সর্বত্র অনুসৃত হলেও বিশ শতকেরই দ্বিতীয়ার্ধে এসে তাতে নতুন মাত্রা সংযুক্ত হয়। দুটো পদ্ধতিগত ভিন্নতায় ভাষা চর্চাকে প্রবহমান রাখা যেতে পারে। প্রথমত, ভাষাকে দেখা যেতে পারে ভেতর থেকে— যেখানে বক্তা থাকবে অপরিজ্ঞাত, প্রতিপার্শ্ব থাকবে অবিবেচ্য। অর্থাৎ, ভাষা কোনো প্রকার অভাষিক ধ্রুবকের বিবেচ্য হবে না। দ্বিতীয়ত, ভাষাকে দেখা যেতে পারে বাইরে থেকে— যেখানে বক্তার ভাষিক উপস্থাপনা প্রতিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচিত হবে। অতিভাষিক ধ্রুবকও ভাষা বিশ্লেষণে অংশগ্রহণ করবে। নিচের চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করা যেতে পারে:

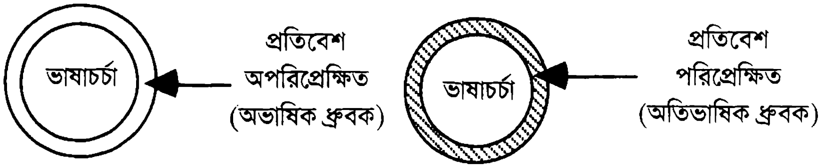

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ভাষা বর্ণনা অনেকখানিই এই অতিভাষিক ধ্রুবক নির্ভর। অতিভাষিক ধ্রুবক এসেছে কখনও সামাজিক, কখনও নৃতাত্ত্বিক, কখনও ভৌগোলিক, কখনওবা গাণিতিক কাঠামো থেকে। ফলে জন্ম হয়েছে 'সমাজভাষাবিজ্ঞান', 'নৃতাত্ত্বিকভাষাবিজ্ঞান', 'ভৌগোলিক ভাষাবিজ্ঞান', 'গাণিতিক ভাষাবিজ্ঞান'-এর মতো আন্তর্শৃঙ্খলাবিজ্ঞান (Inter-disciplinery Science)। 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' (Sociolinguistics) ভাষাবিজ্ঞানের প্রবল পরাক্রমশালী সেই শাখা যেখানে সমাজ-সংশ্রয় এবং ভাষা-সংশ্রয় যুগপৎ বিশ্লেষণে মূর্ত হয়ে ওঠে।

ভাষা ও সমাজ পরস্পর সম্পর্কিত। অর্থাৎ সমাজের অস্তিত্বেই ভাষার অস্তিত্ব; ভাষার অস্তিত্বেই সমাজের অস্তিত্ব। সমাজবিহীন ভাষা যেমন অকল্পনীয়, তেমনি ভাষাবিহীন সমাজও অকল্পনীয়। এ দুয়ের পারস্পর্য নিচের সূত্রে বিধৃত :

(ক) ভাষা মানুষ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।

(খ) মানুষ সামাজিক জীব।

(গ) সুতরাং ভাষা সামাজিক জীবের সম্পদ।

(ঘ) সুতরাং প্রতিটি ভাষাই সামাজিক ভাষা।

আরোহমূলক পদ্ধতিতে (Inductive Way) বিশেষ থেকে সাধারণ সূত্র প্রতিষ্ঠায় উপরি-উক্ত চারটি বিবৃতি উপস্থাপিত হয়েছে। নিচের চিত্র লক্ষণীয় :

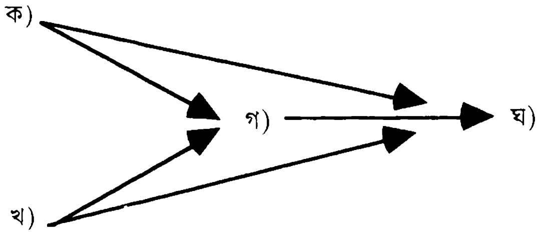

ক) এবং খ) বিবৃতি গ) বিবৃতি সৃষ্টির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। গ) বিবৃতি সৃষ্টি করেছে ঘ) বিবৃতির সিদ্ধান্ত। ঘ) বিবৃতি গ) বিবৃতির যেমন অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তেমনি ক) এবং খ) বিবৃতির যৌথ পরিণতির অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী ফসলও বটে। আরোহমূলক পদ্ধতির উপযোগিতা বর্ণনায় রামেশ্বর শ' যথার্থই বলেন :

> ভাষাবিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে, বিশেষ ভাষা থেকে শুরু হয়; কিন্তু ক্রমশঃ তা অধিকতর সাধারণ সূত্রের দিকে এগিয়ে যায়। সবশেষে তা ভাষার এমন সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করে যা সাধারণভাবে সব ভাষারই মূল প্রক্রিয়া ব্যাখ্যায় সহায়তা করে।[৩]

সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চায়ও স্বাভাবিকভাবে এই আরোহমূলক পদ্ধতিই প্রত্যাশিত। সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষাকে বিশ্লেষণ করাই 'সমাজভাষাবিজ্ঞান'। 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' কী এবং তার লক্ষ্যই বা কী নিচের বক্তব্য থেকে তা প্রতিভাত হয়েছে সুস্পষ্টভাবে :

> ভাষা সংগঠনে ব্যবহৃত ভাষিক উপাদানসমূহ ছাড়াও এ জন্যই আমাদের মনে রাখতে হয় সেই ভৌগোলিক এলাকাকে যেখানে এই ভাষাটি কথিত হয়, সেই সংস্কৃতি এবং সমাজকে যেখানে এটি ব্যবহৃত হয়, সেই প্রতিবেশ এবং পরিস্থিতিকে যেখানে এটি ব্যবহৃত হয়, সেই কথকদের যারা এটি ব্যবহার করে, সেই শ্রোতাদের যাদের জন্য এটি ব্যবহৃত হয় এবং সেই উদ্দেশ্যকে যার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এভাবেই শুধু কোনো ভাষা নিয়ে আমাদের চর্চা পরিপূর্ণ এবং উপলব্ধিগত হতে পারে। সুতরাং আমাদের অবশ্যই ভাষাকে শুধু ভেতর থেকে নয়, বাইরে থেকেও দেখতে হবে। ভাষার অবয়ব এবং ব্যবহার উভয় দিক থেকেই আমাদের ভাষাচর্চা করা উচিত। কোনো ভাষার কথক, শ্রোতা, তাদের সম্পর্ক এবং সংযোগ, প্রতিবেশ এবং পরিস্থিতি, নিবন্ধ শিরোনামা, নিবন্ধের উদ্দেশ্য এবং অবয়বের ভিত্তিতে বাক্ব্যবহারের চর্চাই হলো *সমাজভাষাবিজ্ঞান*।[৪]

ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাস খুব দীর্ঘ হলেও সমাজভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাস নাতিদীর্ঘ। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সূচনালগ্নেই এর উদ্ভব। যদিও সমাজ এবং পরিবেশকে বিবেচনায় রেখে সমাজভাষাবিজ্ঞান উদ্ভবের আগে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দু'স্থানেই বিচ্ছিন্ন দু'চারটি প্রবন্ধও লিখিত হয়েছে, তবে যেহেতু প্রবন্ধ লিখনকালে ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখা হিশেবে

সমাজভাষাবিজ্ঞান উপ-বিভাগটি (Sociolinguistic Sub-discipline) গড়ে ওঠেনি, এমনকি তার ধারণাটিরও (Concept) আবির্ভাব ঘটেনি, ফলে এ গুটিকয়েক প্রবন্ধে এ উপ-বিভাগের পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গিও (Methodological Approach) স্বাভাবিকভাবেই অনুসৃত হয়নি। তাই ব'লে এ সকল প্রবন্ধের ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য কম নয়। হাউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক হাভের সি. কুরি ১৯৫২ সালে 'এ প্রজেকশন অব সোশিওলিঙ্গুইস্টিকস : দি রিলেশনশিপ অব স্পিচ টু সোশ্যাল স্ট্যাটাস' শীর্ষক প্রবন্ধে 'সোশিওলিঙ্গুইস্টিকস' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করলেও ভাষাবিজ্ঞানে পরিভাষাটির প্রথম প্রচলন করেন উইলিয়াম ব্রাইট এবং এ.কে. রামানুজন ১৯৬২ সালে নবম আন্তর্জাতিক ভাষাবিজ্ঞানী সম্মেলনে।[৫]

গত প্রায় চার দশক ধ'রে চলছে সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চা। ভাষাবিজ্ঞানের, বলা যেতে পারে, সবচেয়ে বিকাশমান শাখা এটি, যদিও আবির্ভাবকালেই ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক আলোচিত হবে কোন্ পরিভাষার আবরণে—তা নিয়ে দেখা দিয়েছে দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব সর্বাপেক্ষা বেশি হয়েছে 'সোশিওলিঙ্গুইস্টিকস' এবং 'সোশিওলজি অব ল্যাঙ্গুয়েজ' পরিভাষা দুটি নিয়ে। বাংলায় বলা যেতে পারে—যথাক্রমে 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' এবং 'ভাষার সমাজবিজ্ঞান'। লেবভ, ফিশম্যান, ডেল হাইমস, হার্টজলার প্রমুখের আলোচনায় এ দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটলেও ধীরে ধীরে তা 'সমাজভাষাবিজ্ঞান'-এ স্থিরতা লাভের পর্যায়ে উপনীত। এ দুয়ের পাশাপাশি 'এথনোগ্রাফি অব স্পিকিং', বাংলায় বলা যেতে পারে—'কথনের নৃবৃত্ততত্ত্ব'-ও দুর্লভ নয়। তবে বর্তমানে 'কথনের নৃবৃত্ততত্ত্ব' আর 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' সমান্তরাল হিশেবে বিবেচ্য নয়, বরং এর শাখা হিশেবেই মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' এবং 'ভাষার সমাজবিজ্ঞান'—স্থূল অর্থে একই বিষয় নির্দেশকারী হলেও সূক্ষ্ম অর্থে এ দুয়ের কিঞ্চিৎ পার্থক্য রয়েছে। কি ইংরেজি কি বাংলা—উভয় পরিভাষাই নির্দেশ করে যে 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' এবং 'ভাষার সমাজবিজ্ঞান' ভাষাবিজ্ঞানের শাখা। 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' ভাষাবিজ্ঞানের অঙ্গীভূত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ না থাকলেও 'ভাষার সমাজবিজ্ঞান'-কে কখনও কখনও সমাজবিজ্ঞানের অংশ হিশেবে বিবেচনা করা হয়। ভাষা এবং সমাজের সম্পর্ক অধ্যয়নে গবেষণাকারী সমাজ বিশ্লেষণেই অধিকতর আগ্রহী হলে তবে তা 'ভাষার সমাজবিজ্ঞান'; অন্যদিকে অনুসন্ধানকারীর নজর বা গুরুত্ব যদি ভাষা বিশ্লেষণে অধিক ব্যাপৃত হয়, তবে তা 'সমাজভাষাবিজ্ঞান'। হাডসন-এর বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

> সমাজভাষাবিজ্ঞান এবং ভাষার সমাজবিজ্ঞানের কোন্‌টির ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়, অনুসন্ধানকারী কি ভাষায় না কি সমাজে অধিকতর আগ্রহী এবং সেই সঙ্গে তিনি কি ভাষা না কি সমাজ সংগঠন বিশ্লেষণে অধিকতর পারদর্শী তার ওপর নির্ভর করে এ দু'য়ের পার্থক্য। যেহেতু পরস্পরকে অতিক্রম করার দু'য়েরই রয়েছে ব্যাপক ক্ষেত্র, সেহেতু বর্তমানে এ দুই শৃঙ্খলাকে অধিকতর সুস্পষ্টরূপে বিভক্তির চেষ্টা নিরর্থক বলেই মনে হয়।[৬]

একই ধরনের অনুরণন খুঁজে পাওয়া যায় ট্রাজিল-এর বক্তব্যে। যখন তিনি বলেন, "সমাজভাষাবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের সেই অংশ যা ভাষার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ের সঙ্গে

সম্পর্কিত", তখন 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হলেও 'সোশিওলজি অব ল্যাঙ্গুয়েজ' বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য "ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ কীভাবে, কখন ও কেন ভাষিক বৈচিত্র্যের ব্যবহার করে এবং ভাষা ও সমাজের সম্পর্কের সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত দিকের সঙ্গে এটি বিশেষভাবে সম্পর্কিত" বক্তব্য উপস্থাপনে তিনি একে ভাষাবিজ্ঞানের পূর্ণ অন্তর্ভুক্তির বিবেচনায় আনছেন না।[৭]

'সমাজভাষাবিজ্ঞান', 'ভাষার সমাজবিজ্ঞান', 'ভাষা ও সমাজ : পারস্পরিক সম্পর্ক'— প্রভৃতি শিরোনামে প্রায় চার দশক ধ'রে পদ্ধতিগতভাবে (Methodologically) ভাষাসূত্র-সমাজসূত্র আলোচিত হয়ে আসলেও এর প্রায় পুরোটাই প্রতীচ্যে; প্রাচ্যে এর অনগ্রসরতা লক্ষণীয়। অপরাপর বিভাগ-উপবিভাগের আলোচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি অগ্রগামী। বাংলাভাষী অঞ্চলে দীর্ঘকাল এ বিষয়ক তত্ত্বমূলক গ্রন্থ-প্রবন্ধ ছিল না।[৮] তারপরও বলা যায় বাংলাভাষী অঞ্চলে এ বিষয়ক আলোচনায় যাঁরা উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন— পশ্চিমবঙ্গে পবিত্র সরকার এবং মৃণাল নাথ, বাংলাদেশে মুহম্মদ আবদুল হাই, মনিরুজ্জামান, মনসুর মুসা এবং রাজীব হুমায়ুন।

পবিত্র সরকার *ভাষা দেশ কাল* এবং *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি* শীর্ষক দুটি গ্রন্থভুক্ত বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় বিষয়ের অবতারণা করেছেন। মৃণাল নাথের প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ পরে আলোচিত হবে। মুহম্মদ আবদুল হাই *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* শীর্ষক গ্রন্থ রচনা ছাড়াও 'ভাষা ও সমাজজীবন', 'ভাষা ও সুভাষণ', 'ক্যান ল্যাঙ্গুয়েজ বি প্ল্যানড?', 'দি ইমপ্যাক্ট অব সোসাইটি অন ল্যাঙ্গুয়েজ', 'ইসলামিক আসপেক্ট অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। মনিরুজ্জামান 'সংবাদ শিরোনামের ভাষা', 'ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশ : ভাষাতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত', 'পান্থ ভাষা', 'প্রান্তিক সীমায় ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষার অবস্থান ও সংযোগ প্রকৃতি : রাখাইন প্রসঙ্গ', 'ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ ইন এডুকেশন, এডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড মাস-মিডিয়া' 'ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ : বাংলাদেশ—এ কেস স্টাডি' 'ল্যাঙ্গুয়েজ প্লানিং অব অ্যান এথনিক মাইনরিটি গ্রুপ অব বাংলাদেশ : দি চাকমা', 'গ্রুপ রিপোর্ট অব দি ক্রাইটেরিয়া ফর সাকসেস ইন টার্ম প্ল্যানিং অ্যান্ড ভোকাবুলারি প্ল্যানিং', 'ডাইগ্লসিয়া ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ প্ল্যানিং' (উদয় নারায়ণ সিংহের সঙ্গে যৌথভাবে) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা ছাড়াও *স্টাডিজ ইন দি বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ* গ্রন্থভুক্ত সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। মনসুর মুসার আগ্রহ সমাজভাষাবিজ্ঞানের পাশাপাশি ভাষা পরিকল্পনায়ও। *ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ভাষা পরিকল্পনার সমাজতত্ত্ব, বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা, ভাষা, শ্রেণী ও সমাজ, ভাষাচিন্তা : প্রসঙ্গ ও পরিধি, ল্যাঙ্গুয়েজ প্ল্যানিং ইন শ্রীলঙ্কা*—প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি তাত্ত্বিক কাঠামোয় এবং প্রকৃত গবেষকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবন্ধের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। রাজীব হুমায়ুনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দুটি— *সমাজভাষাবিজ্ঞান* এবং *সোশিওলিঙ্গুইস্টিক অ্যান্ড ডেসক্রিপটিভ স্টাডি অব সন্দ্বীপী : এ বাংলা ডায়লেক্ট*। প্রথম গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি ভাষা সংগঠনের উপর সমাজ সংগঠনের প্রভাবকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

উপরি-উক্ত গ্রন্থ-প্রবন্ধ ছাড়াও ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের *অপরাধ জগতের ভাষা,* হুমায়ুন আজাদের *বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র*, রফিকুল ইসলামের 'ল্যাঙ্গুয়েজ প্ল্যানিং ইন বাংলাদেশ', আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের 'বাংলা লিঙ্গে সামাজিক চেতনার প্রতিফলন', মুহম্মদ এনামুল হকের 'সরকারী চিঠিপত্রে সম্বোধন ও বিনয় প্রকাশের বাংলা পদ্ধতি', 'সামাজিকতার ভাষা', 'মুসলমানী বাঙ্গালা', আফিয়া দিলের 'বেঙ্গলি বেবি টক', নুরুল হুদার 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষার উন্নয়ন', খ.ম. আব্দুল আউয়ালের 'দৃশ্যমান ভাষা', গোপাল হালদারের 'আদার ব্যাপারী ভাষার খবর', পুণ্যশ্লোক রায়ের 'ভাষার সমতা', নির্মল দাশের 'উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ', 'উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষা', দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর 'গোত্র, গণ, গ্রাম', দীপঙ্কর দাশগুপ্তের 'কলকাতার ভাষাচিত্র', তরুণ ভট্টাচার্যের 'কলকাতার ভাষা', মঞ্জুলী ঘোষের 'বিহারের দ্বিভাষিক বাঙালী ও বাংলা ভাষা', সুধীরকুমার করণের 'সীমান্ত বাংলার গ্রাম-নাম ও অস্ট্রিক প্রভাব', সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা পদবী', খগেন্দ্রনাথ ভৌমিকের 'পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস', নৃপেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'নির্বাচন ও ভাষা', 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে স্ল্যাং', সুনির্মল দাশের 'জল বনাম (?) পানি', সুভাষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা ভাষায় সৌজন্য ও শিষ্টাচার', 'বাংলা সংবাদপত্রের শিরোনাম', ভবতারণ দত্তের 'লিঙ্গুইস্টিক স্টাডি অব প্রপার নেমস অ্যান্ড সারনেমস অব বেঙ্গলি', কৃষ্ণপদ গোস্বামীর 'প্লেস-নেমস অব বেঙ্গল' সুকুমার সেনের 'প্লেস-নেমস অব বেঙ্গল' প্রভৃতি রচনা সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয়কে আলোকিত করেছে। উপরি-উক্ত গ্রন্থ-প্রবন্ধ যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের সবাই যেমন প্রথাগত শিক্ষায় প্রশিক্ষিত ভাষাবিজ্ঞানী নন, তেমনি তাঁদের বেশিরভাগ রচনাই সমাজভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতি নির্ভর নয়। তবুও এ সকল রচনার সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক মূল্য একেবারে কম নয়।

মৃণাল নাথের সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ দুটি—*সমাজভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা* (১৯৮৯) এবং বর্তমান আলোচ্য *ভাষা ও সমাজ* (১৯৯৯)। উপরি-উক্ত সকল গ্রন্থ-প্রবন্ধের সঙ্গে এ গ্রন্থ দুটোর পার্থক্য এখানে যে দুটো গ্রন্থই সম্পূর্ণভাবে সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটি সাংগঠনিক কাঠামোয় নির্মিত; 'অভিব্যক্তি' এবং 'আধেয়' উপস্থাপনে কৃতকার্য; সামাজিক ভাষার অখণ্ড বিশ্লেষণে দায়বদ্ধ; বিশেষ থেকে সাধারণ সূত্রীকরণে পরিমিত; *ভাষার সমাজবিজ্ঞান*-এর প্রান্তিক আলোচনা পর্যন্ত প্রলম্বিত। এটি চার দশক ধ'রে বিকশিত সমাজভাষাবিজ্ঞানের প্রায় সকল ধারণাকে পরিধির প্রান্তসীমা পর্যন্ত স্পর্শ করেছে।

মৃণাল নাথের পূর্বে রচিত গ্রন্থটি ছাড়া এ জাতীয় গ্রন্থ, বাংলা ভাষায় তো বটেই, বাংলাভাষী অঞ্চলেই দ্বিতীয়টি নেই। এমনকি এ বক্তব্য ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটেও একইভাবে প্রযোজ্য। এটি মৌলিক কোনো গবেষণা গ্রন্থ না হলেও বিষয় বিশ্লেষণের অনুপুঙ্খতায়, তত্ত্বের সমর্থনে তথ্যের প্রয়োগে লেখকের অনুসন্ধিৎসু মন গ্রন্থ-পাঠকদের বিমুগ্ধ করে বারংবার। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

মৃণাল নাথ রচিত এই গ্রন্থটির মূল আলোচনা চারটি বর্গে বিভক্ত। এগুলো হলো : ১. অন্যোন্যক্রিয়াবাচক আক্রম ২. পরস্পরসম্বন্ধী আক্রম ৩. ভাষা পরিবর্তন এবং ভাষা সংযোগ আক্রম

এবং ৪. ভাষা সমস্যার আক্রম। মূল বিষয়ে যাবার পূর্বে রয়েছে—ভূমিকা এবং অবতরণিকা: গ্রন্থ সমাপনীতে—উল্লেখপঞ্জি এবং বিষয়সূচি।

'ভূমিকা' অংশে লেখক এ গ্রন্থ লেখার প্রক্রিয়া এবং এ বিষয়ক লেখায় 'পরিভাষা'-ই যে সবচেয়ে বড়ো বাধা—তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। পরিভাষা প্রসঙ্গটিতে আমরা পরে আলোকপাত করব। 'অবতরণিকা' অংশে সমাজভাষাবিজ্ঞানের পরিচয়, পরিভাষা হিশেবে 'সোশিওলিঙ্গুইস্টিকস' এবং 'সোশিওলজি অব ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর উদ্ভবের পটভূমি, উপ-বিভাগটির মূল কাঠামো এবং এর পরিধিতে কোন্ কোন্ বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ঘটতে পারে, কাঁদের অবদানে পরিপুষ্ট হয়েছে এ বিদ্যা, বাংলাভাষী অঞ্চলে কাঁরা এ বিষয়ক কর্মে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন এবং বর্তমান গ্রন্থ কাঠামোটি কীভাবে বিন্যস্তীকৃত হয়েছে—তার পরিচিতিমূলক স্বল্প পরিসর বর্ণনা লক্ষণীয়। সমাজভাষাবিজ্ঞানের পরিচয় নির্দেশে তিনি বলেন :

> সমাজ ও ভাষার সম্পর্ক বিচার করে যে শাস্ত্র তাই সমাজভাষাবিজ্ঞান। সমাজভাষাবিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত এক আধুনিক বিদ্যা। অতি সাম্প্রতিককালে এই শাস্ত্রের চর্চা শুরু হয়। ... ... সমাজভাষাবিজ্ঞান এমন একটি ভাষা বিষয়ক শাস্ত্র যাকে ভাষাতত্ত্ব ছাড়াও অন্য বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষিত থেকে বিচার করা হয়ে থাকে। ভাষা ও সমাজের পারস্পরিক তথা আন্তঃ-সম্পর্ক এই শাস্ত্রের উপজীব্য বিষয়।[৯]

ভাষা ও সমাজের আন্তঃ-সম্পর্ক এ শাস্ত্রের উপজীব্য হওয়াতেই তিনি তাঁর গ্রন্থের শিরোনামা নির্ধারণ করেছেন *ভাষা ও সমাজ*। এমনও হতে পারে যে তিনি *সমাজভাষাবিজ্ঞান* অথবা *ভাষার সমাজবিজ্ঞান* গ্রন্থনাম নির্বাচন না ক'রে বিতর্ক পরিহার করেছেন। একই সঙ্গে এটাও আমরা জানি যে, অতি আধুনিক শাস্ত্র হওয়ার কারণে এর বিষয়বস্তুর মতো এ শাস্ত্র নির্দেশক নামটিও এখনও পর্যন্ত সুস্থির হয়নি। সমাজভাষাবিজ্ঞানের যাবতীয় আলোচ্য বিষয় একটি স্বউদ্ভাবিত ফ্রেমভুক্ত ক'রে তিনি একে উপস্থাপনে সচেষ্ট হয়েছেন। ইন্টারেকশনাল সোশিওলিঙ্গুইস্টিকস-কে অন্যোন্যক্রিয়াবাচক আক্রম অভিধায় চিহ্নিত ক'রে ভাষার ওপর সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাবের প্রকৃতি, কোরিলেশনাল সোশিওলিঙ্গুইস্টিকস-কে পরস্পরসম্বন্ধী আক্রমে চিহ্নিত ক'রে এ দুয়ের আন্তঃ-সম্পর্ক, ল্যাঙ্গুয়েজ চেনজ্ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কনট্যাক্ট সোশিওলিঙ্গুইস্টিকস-কে ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা সংযোগ আক্রমে চিহ্নিত ক'রে ভাষার পরিবর্তনে সামাজিক প্রেষণা ও ভাষা সংযোগের ফলে ভাষার পরিবর্তন, উদ্ভব, বিকাশ, মৃত্যু প্রভৃতি প্রসঙ্গ এবং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রব্লেমস সোশিওলিঙ্গুইস্টিকস-কে ভাষা সমস্যার আক্রমে নির্দেশ ক'রে সচেতন ভাষা পরিবর্তনের ছকে ভাষা পরিকল্পনা আলোচনা করেছেন। এ রকম একটি ফ্রেম উদ্ভাবনের জন্য তিনি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

'অন্যোন্যক্রিয়াবাচক আক্রম'-এ 'সংজ্ঞাপনের নৃবৃত্ততত্ত্ব', 'সংজ্ঞাপক দক্ষতা', 'সংজ্ঞাপক পরিস্থিতি, সংজ্ঞাপক ঘটনা এবং সংজ্ঞাপক কার্য', 'বাক সম্প্রদায়', 'বাক ভাণ্ডার এবং কথন ভাণ্ডার', 'প্রয়োগ ক্ষেত্র', 'সমাজভাষিক সূত্র', 'ক্ষমতা ও সংহতির সমস্যা', 'আত্মীয়তাবাচক শব্দ' এবং 'ভাষিক আপেক্ষিকতাবাদ' বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে। কথনের নৃবৃত্ততত্ত্ব কীভাবে সংজ্ঞাপনের নৃবৃত্ততত্ত্বে (Ethnography of Communication) রূপ লাভ করল ডেল হাইমসের অনুসরণে

লেখক তা ব্যাখ্যা করেছেন। সংজ্ঞাপনের নৃবৃত্ততত্ত্ব আমাদের শেখায় যে, কোনো ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডার জানার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সমাজ-সংস্কৃতির জ্ঞান থাকলেই শুধু সংজ্ঞাপন সম্ভব; অন্যথায় নয়। চমস্কি প্রবর্তিত সংজ্ঞাপক দক্ষতাকে (Linguistic Competence) ডেল হাইমস অপূর্ণ আখ্যায়িত ক'রে সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাপক দক্ষতার (Sociolinguistic Competence) ধারণায় একে পরিপূরণ করেন। সংজ্ঞাপন প্রকৃতির চমৎকার বর্ণনা রয়েছে 'সংজ্ঞাপক পরিস্থিতি, সংজ্ঞাপক ঘটনা এবং সংজ্ঞাপক কার্য' শীর্ষক আলোচনায়। বাক সম্প্রদায়ের (Speech Community) ধারণায় ব্লুমফিল্ড, চমস্কি এবং লায়নসের বক্তব্যের বিরুদ্ধে গাম্পার্য এবং ডেল হাইমসের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছেন লেখক। ব্লুমফিল্ডের ভাষ্য স্মরণীয় :

> মানব জাতি বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করলেও কোনো বিশেষ উদ্দীপনায় উচ্চারিত বিশেষ কোনো বাগ্ধ্বনি মানুষের গোত্রভেদে ভিন্ন হয়। বাক্ সম্প্রদায় হলো এমন এক দল মানুষ যারা ভাষা সংকেতের একই সংশ্রয় ব্যবহার করে।[১০]

স্পষ্টতই ব্লুমফিল্ড বাক সম্প্রদায়কে ভাষার সমার্থক ক'রে ফেলেছেন। ডেল হাইমস ভাষার একটি রূপকে বাক সম্প্রদায় হিশেবে নির্দেশ করতে চান :

> ভাষা পরিচালন এবং ব্যাখ্যানের সূত্রসমূহের জ্ঞানের অংশীদারিত্ব হলো একটি সম্প্রদায়। এই অংশীদারিত্ব ভাষার অন্ততপক্ষে একটি রূপের জ্ঞানসৃষ্টিতে সহায়ক। এ এমন জ্ঞান যা ভাষা ব্যবহারের আদর্শ রীতি নির্ভর। (পৃ ২৮)

বাক ভাণ্ডার (Speech Repertoire) এবং কথন ভাণ্ডারকে (Verbal Repertoire) অনেকেই এক ক'রে ফেলেন, যদিও দুয়ের মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম পার্থক্য। বাক সম্প্রদায় যেখানে কোনো ভাষিক গোষ্ঠীকে নির্দেশ করছে, সেখানে বাক ভাণ্ডার এবং কথন ভাণ্ডার পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য নিয়ে গোষ্ঠীকে নয়, তাদের বিবৃতির বৈচিত্র্যকে নির্দেশ করছে। প্রয়োগক্ষেত্র (Domain) হলো ভাষা ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যময় স্থান। যেমন—শ্রেণীকক্ষ, দপ্তর, মসজিদ, রেস্তোরা, বিয়ে বাড়ি ইত্যাদি। একজন মানুষ যে পরিচয়ে যে বৈশিষ্ট্যময় স্থানে যাবে, তার বাচনে ঐ স্থান-অনুকূল বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটবে। সুজান আরভিন-ট্রিপ অনুসরণে বিকল্প সূত্র, পারম্পর্য সূত্র এবং সংগতি সূত্রের মাধ্যমে সমাজভাষিক সূত্র ব্যাখার প্রয়াস লেখকের। সমাজভাষিক সূত্র ভাষা ব্যবহারের সামাজিক নিয়মের ওপর আলোকপাত করে। ফরাশি, জার্মান, ইতালীয় এবং স্পেনিশ ভাষার মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহারে ক্ষমতার তাৎপর্য ব্যাখ্য করেছেন ব্রাউন এবং গিলম্যান। এ আলোচনাই ক্ষমতা ও সংহতির সমস্যা (Power and Solidarity Problem) বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। বিবাহ-প্রথা এবং শিশু ভূমিষ্ঠের মাধ্যমে কীভাবে আত্মীয়তাবাচক শব্দ তৈরি এবং রক্ষিত হয়, তারই আলোচনা লক্ষণীয় আত্মীয়তাবাচক শব্দ (Kinsheep Terms) অধ্যায়ে। ভাষিক আপেক্ষিকতাবাদে (Linguistic Relativity) সাপির হোর্ফ প্রবন্ধ আলোচিত হয়েছে যার দর্শন হলো—মানুষের শব্দভাণ্ডার এবং ব্যাকরণই ভাষীকে জগৎ-দর্শনে প্রস্তুত ক'রে তোলে।

'পরস্পরসমন্ধী আক্রম'-এ 'ভাষা বৈচিত্র্য', 'রেজিস্টার', 'রীতি', 'দ্বিবাচন', 'বয়স', লিঙ্গ', 'জাতি', 'নৃগোষ্ঠী', 'ধর্ম', 'উপভাষা', 'সামাজিক শ্রেণী', 'সমাজোপভাষা', 'সঙ্কুচিত ও বিস্তৃত কোড' এবং 'ভাষা মনোভঙ্গি'—এই চৌদ্দটি বিষয় স্থান পেয়েছে। যদিও অনেকেই মনে করেন যে ভাষা বৈচিত্র্য (Language Variation) অধ্যয়নই সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, কিন্তু আসলে তা নয়। এটি অন্যতম প্রধান কাজ। ভাষার রূপভিন্নতা ঘটে ভাষার নির্বাহনগত ভেদের কারণে। এরই ফসল রেজিস্টার, দ্বিবাচন, উপভাষা ইত্যাদি। প্রসঙ্গের পরিবর্তনে ভাষা ব্যবহারের পরিবর্তনকেই লেখক প্রসংগতি (Register) হিশেবে নির্দেশ করেছেন। কারও কারও মতে, পেশাগত কারণে বাক ভিন্নতার সংঘটন হলো প্রসংগতি। এ জন্যে একে নির্বাহনগত বুলি (Functional Variety) হিশেবেও চিহ্নিত করা হয়। মূলত মার্টিন জোস এবং লেবভের অনুসরণে লেখক রীতি (Style) বিষয়ক আলোচনা করেছেন। জোস নির্দেশিত রীতিগুলো হলো—জড় রীতি, বিধিগত রীতি, আলোচনী রীতি, আপতিক রীতি এবং অন্তরঙ্গ রীতি। লেবভ রীতির পরিবর্তনে ভাষার পরিবর্তন ঘটে ব'লে পরিসংখ্যানধর্মী আলোচনা করেছেন। ফার্গুসন উদ্ভাবিত দ্বিবাচনকেই (Diglossia) লেখক অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতাকারে এ গ্রন্থের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। চারটি বাক সম্প্রদায় থেকে ফার্গুসন যে নয়টি দ্বিবাচনিক বৈশিষ্ট্য বের ক'রে নিয়ে এসেছেন তার ক্রমিক আলোচনা লক্ষণীয়। তবে এ অংশের মূল আলোচনা এই প্রশ্নে যে—বাংলা ভাষায় দ্বিবাচন উপস্থিত কি না। ফার্গুসন উচ্চ বুলি (High Variety) এবং নিম্ন বুলি (Low Variety)-কে দ্বিবাচন নির্দেশের অন্যতম মানদণ্ড বিবেচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> দ্বিবাচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি হলো H এবং L ফাংশনগত বৈশিষ্ট্য। এক ধরনের বিশেষ পরিস্থিতিতে শুধু H এবং অন্য ধরনের বিশেষ পরিস্থিতিতে শুধু L রূপের ব্যবহার যথাযথ। দু'রূপের সংমিশ্রণ ঘটে অতি নগণ্য মাত্রায়।[১১]

এছাড়াও দ্বিবাচন নির্দেশে ফার্গুসন প্রস্তাব করেছেন আরও আটটি মানদণ্ডের। বাংলা ভাষায় দ্বিবাচন আছে—এমন বক্তব্যের ঘোর বিরোধিতা ক'রে বিস্তৃত ব্যাখ্যায় তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন বর্তমান লেখক। বয়স, লিঙ্গ, জাতি,নৃগোষ্ঠী, ধর্ম—ইত্যাদি কারণে যে ভাষায় পার্থক্য থাকে তার বর্ণনা রয়েছে উল্লেখিত শিরোনামার প্রবন্ধসমূহে। লেবভ, ফ্যাসোল্ড, ট্রাজিল, ডাউনস, হেলফরিশের গবেষণার ফল বর্ণনার মাধ্যমে নবীন-প্রবীণ ভাষার রূপভিন্নতা নির্দেশ করা হয়েছে 'বয়স' অধ্যায়ে; যেসপারসন, সারদাচরণ মিত্র, হেনরি থেকে শুরু ক'রে মেরি হাস, ফিশার, লেবভ, ট্রাজিল প্রমুখের অনুসরণে স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি, রূপমূল, অন্বয়, স্বরাঘাত এমনকি বাগর্থ পর্যায়ের উদাহরণের মাধ্যমে নারী-পুরুষের ভাষিক ভিন্নতা উপস্থাপন করা হয়েছে। 'জাতি'-র আলোচনায় স্থান পেয়েছে দক্ষিণ ভারতের কন্নড, টুলু, তামিল ছাড়াও উত্তর এবং পশ্চিম ভারত। এ আলোচনাও ধ্বনি, শব্দ, বুৎপত্তির মতো বিভিন্ন ভাষিক স্তরে পরিচালিত হয়েছে। কৃষ্ণকায় এবং শ্বেতকায়দের ভাষিক ভিন্নতা 'নৃগোষ্ঠী' পর্যায়ে এবং মুসলমানের ভাষিক ভিন্নতা 'ধর্ম' পর্যায়ে উদাহরণ সহযোগে বর্ণিত হয়েছে। 'রিজিওনাল ডায়লেক্ট' শিরোনামে 'উপভাষা' এবং 'সোশ্যাল ডায়লেক্ট' শিরোনামে সমাজোপভাষা আলোচিত হলেও স্থূল অর্থে 'ডায়লেক্ট' কে 'উপভাষা' এবং 'সোশিওলেক্ট'-কে 'সমাজোপভাষা' হিশেবে চিহ্নিত

করা যায়। কোনো অঞ্চলের ভাষা বিশ্লেষণে সামাজিক প্রেক্ষাপট অবিবেচিত হলে তাকেই 'উপভাষাতত্ত্ব' বলা যায়। দ্বিকল্প বৈশিষ্ট্যের (Binary Feature) ভিত্তিতে এ দুয়ের বৈশিষ্ট্য লেখক কর্তৃক নিম্নরূপে প্রদর্শিত হয়েছে :

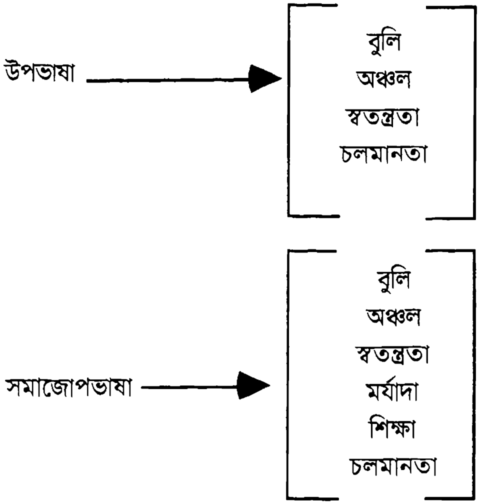

(পৃ. ১৫২)

লেবভ যেখানে তিনটি মানদণ্ডের (পেশা, শিক্ষা, আয়) সাহায্যে সামাজিক শ্রেণী (Social Class) নির্ধারণ করেছেন, সেখানে ব্রাজিলের মানদণ্ড ছটি (পেশা, আয়, শিক্ষা, আবাস, এলাকা, পিতার আয়)। পরিসংখ্যানের মাধ্যমে অধ্যায়টি ঋদ্ধতা লাভ করেছে। 'সঙ্কুচিত ও বিস্তৃত কোড' শিরোনামায় বার্নেস্টাইনের 'রেস্ট্রিকটেড অ্যান্ড ইলাবরেটেড কোড' আলোচিত হয়েছে। লেবভের মতে এ 'তত্ত্ব' অলীক এবং বিপজ্জনক; এর কোনো সারবত্তা নেই। 'ভাষা মনোভঙ্গি' ভাষার প্রতি মানুষের মনোভাবের প্রকৃতি নির্ভর। বিষয়টি সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক ধারণায় প্রতিষ্ঠিত।

'ভাষা পরিবর্তন এবং ভাষা সংযোগ আক্রম'-এ 'ভাষা পরিবর্তন', 'ভাষা পরিবর্তনে সামাজিক প্রেষণা', 'সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক ভেদরূপ', 'ভাষা সংযোগ', 'দ্বিভাষিকতা', 'বহুভাষিকতা', 'ভাষা অঞ্চল', 'ঋণকৃতি', 'কোড সরণ : কোড-মিশ্রণ, কোড-পরিবর্তন', 'পিজিন এবং ক্রেয়ল', 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' এবং 'ভাষা সংরক্ষণ এবং ভাষা সরণ'—এই বারোটি বিষয় স্থান পেয়েছে। 'ভাষার পরিবর্তন' ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। কিন্তু ভাষার চলমান পরিবর্তনের (Change in Progress) ব্যাখ্যা সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। ভাইনরাইখ এবং লেবভের তত্ত্বে এটি পরিস্ফুট। ভাষা পরিবর্তনে সামাজিক অনুঘটকের প্রকৃতিগত ভূমিকা নির্দেশ করেছেন লেবভ। আর এই বিষয়টিই আলোচিত হয়েছে 'ভাষা পরিবর্তন' এবং 'ভাষা পরিবর্তনে সামাজিক প্রেষণা' অধ্যায় দুটোতে। 'ভেদরূপ' (Variable) পরিভাষাটি সংখ্যাতত্ত্বে (Statistics) ব্যবহৃত হলেও সমাজভাষাবিজ্ঞানে এর সার্থক প্রয়োগ করেছেন লেবভ। তিনি নিউইয়র্ক শহরের ভাষা-অনুসন্ধানে চিহ্নিতক, সূচিতক

এবং স্থানুরূপ—এ তিন ধরনের ভেদরূপ উদ্ভাবন করেছেন। এ ভেদরূপকে লেবভ সূত্রাবদ্ধ ক'রে 'ভেদরূপ সূত্র'-ও উপস্থাপন করেন। 'সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক ভেদরূপ'-এর উপজীব্য এটিই। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কারণে এক ভাষার সঙ্গে আরেক ভাষার সংযোগ ঘটে এবং তার ফলেই আলোচ্য হয়ে ওঠে ভাষা সংযোগ (Language in Contact)। এই ভাষা সংযোগের ফলেই উদ্ভব ঘটে—দ্বিভাষিকতা (Bilingualism), বহুভাষিকতা (Multilingualism), ঋণকৃতি (Borrowing), কোড সরণ : কোড-মিশ্রণ, কোড-পরিবর্তন (Code Shifting : Code Mixing, Code Switching), পিজিন এবং ক্রেয়ল (Pidgin and Creole), লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা (Lingua Franca), ভাষা সংরক্ষণ ও ভাষা সরণ (Language Maintenance and Language Shift) বিষয়ক নানা প্রসঙ্গ। একটি অঞ্চলে পাশাপাশি দুটো ভাষা প্রচলিত থাকলে তাকে দ্বিভাষিক পরিস্থিতি; দুয়ের বেশি ভাষা প্রচলিত থাকলে তাকে বহুভাষিক পরিস্থিতি হিশেবে চিহ্নিত করা হয়। দ্বিভাষিকত্ব এবং বহুভাষিকত্ব অর্জন করতে পারেন একজন ব্যক্তিও। সে ক্ষেত্রে প্রাতিপর্শ্বিক প্রয়োজনটাই মুখ্য। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে এ বিষয় দুটো আলোচিত হয়েছে 'দ্বিভাষিকতা' এবং 'বহুভাষিকতা' শিরোনামায়। ভাষা সংযোগের প্রায় অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো 'ঋণকৃতি'। ঋণকৃতি প্রধানতই ঘটে শব্দ গ্রহণে। এতে গ্রহীতা-ভাষা সমৃদ্ধ হলেও দাতা-ভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বিভিন্ন বিষয়ক ঋণের উদাহরণ সন্নিবেশিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে। কোড সরণের দুই রূপ : কোড-মিশ্রণ এবং কোড-পরিবর্তন। বাক্যালাপে যদি দুটো ভাষার শব্দ পর্যায়ে বদল ঘটে তবে তা কোড-মিশ্রণ, আর ঐ বদল বাক্য পর্যায়ে হলে তা কোড-পরিবর্তন। এ ধরনের মিশ্রণ-পরিবর্তন অনেক সময়ই হাস্য-রসের সৃষ্টি ক'রে থাকে। আর. এ. হল পিজিন এবং ক্রেয়লের ধারণা দিতে গিয়ে বলেন :

> সংজ্ঞানুসারে পিজিন হলো এমন একটি ভাষা যার সংগঠন দুর্বল, শব্দ সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত এবং যারা এটি ব্যবহার করে তাদের কারোরই নিজস্ব ভাষা নয়। অনুরূপ সংজ্ঞানুসারে ক্রেয়াল হলো এমন একটি পিজিন ভাষা যা কোনো একটি বাক্ সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে।[১২]

অর্থাৎ পিজিন হলো এমন একটি সংযোগ ভাষা, যার শব্দ সংখ্যা নগণ্য এবং যা কোনো ভাষা-সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা নয়। অন্য দিকে পিজিন দীর্ঘকাল ব্যবহারে কোনো ভাষা সম্প্রদায়ের মাতৃভাষায় পরিণত হলে তা-ই ক্রেয়ল। দুই বা ততোধিক ভাষিক সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা ভিন্ন হওয়ার কারণে যদি এমন কোনো ভাষার সাহায্যে তাদের পারস্পরিক সংজ্ঞাপন পরিচালিত হয় যা কারোরই মাতৃভাষা নয় তবে তাকে বলা হয় লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা। পাকিস্তানে উর্দু ভাষা লিঙ্গুয়া ফ্রাংকার মর্যাদায় আসীন। 'পিজিন', 'ক্রেয়ল' এবং 'লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা'—সমাজভাষাবিজ্ঞানের এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাবলীল বর্ণনায় পরিস্ফুট হয়েছে লেখক কর্তৃক। 'ভাষা সংরক্ষণ এবং ভাষা সরণ' শীর্ষক আলোচনা অনেকখানিই 'ভাষা পরিকল্পনা'-র অন্তর্গত বিবেচিত হতে পারে। ভাষা সংরক্ষণ এবং ভাষা সরণ অনেকটা বিপরীত প্রক্রিয়া। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষাকে প্রয়াণ থেকে বাঁচাবার জন্যই 'ভাষা সংরক্ষণ' ধারণার বিকাশ। অন্য দিকে কোনো ভাষা সম্প্রদায় যখন নিজেদের ভাষাকে পরিত্যাগ ক'রে অন্য কোনো ভাষা গ্রহণ

করে তখনই উদ্ভব ঘটে 'ভাষা সরণ'-এর। 'ভাষা সংরক্ষণ এবং ভাষা সরণ' অধ্যায়ে এ বিষয়টিই বিস্তৃত ব্যাখ্যায় উপস্থাপিত হয়েছে।

'ভাষা সমস্যার আক্রম'-এ একটি বিষয়ই স্থান পেয়েছে। তা হলো—'ভাষা পরিকল্পনা'। পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা নেই, যার কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা থাকলেই প্রসঙ্গ আসে তা দূরীকরণের। সমস্যা দূরীকরণের সঙ্গেই জড়িত হলো ভাষা পরিকল্পনা প্রশ্নটির। ভাষার যে স্বতঃস্ফূর্ত এবং অবচেতন পরিবর্তন, তার আলোচনায় ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান; আর ভাষায় সচেতনভাবে যে পরিবর্তন ঘটানো হয় তার আলোচনায় আছে ভাষা পরিকল্পনা। তাই ভাষা পরিকল্পনাকে চিহ্নিত করা হয় 'ফলিত সমাজভাষাবিজ্ঞান' রূপে। ভাষা পরিকল্পনা ধারণাটি বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের হলেও ভাষা পরিকল্পনার উদাহরণ প্রাচীনকালের। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ব্যবহারের সমস্যা দূরীকরণের চেষ্টায় যে মান্যরূপের প্রস্তাবনা, তা থেকেই পাণিনিকে নির্দেশ করা যেতে পারে প্রাচীনতম ভাষা পরিকল্পক হিশেবে। ভাষা পরিকল্পনার পরিধি বহুবিস্তৃত। কোনো একটি জনপদের জন্য মান ভাষা নির্বাচন; ভাষায় একাধিক রীতি থাকলে কোন্ স্তরে কোন্ রীতির ব্যবহার থাকবে—এ প্রসঙ্গ স্থিরীকরণ; ভাষা উন্নয়ন; প্রশাসন, শিক্ষা, বিচারালয়, ব্যবসা—ইত্যাদিতে ব্যবহারের জন্য ভাষা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; লৈখিক রূপের সংসাধন—ইত্যাকার বিচিত্র বিষয় এর পরিধির অন্তর্গত। ভাষা পরিকল্পনার বিস্তৃতিকে হাইনৎস ক্লস ভাষার অবয়ব পরিকল্পনা (Corpus Planning) এবং মর্যাদা পরিকল্পনায় (Status Planning) বিভক্ত করেছেন। হগেন একে ভাগ করেছেন চার অংশে। যথা : অনুশাসনরূপের নির্বাচন, রূপের কোডায়ন, প্রসারণ এবং প্রয়োগ। ইয়ার্নুডের প্রস্তাবনা দ্বিস্তরিক—ভাষা নির্ধারণ এবং ভাষা উন্নয়ন। নেউস্তুপনি আলোচ্য বিষয়কে ধরতে চান পরিকর্ষণ আক্রম এবং নীতিগত আক্রম-এর মাধ্যমে। রিচার্ড নস পরিকল্পনায় তিন নীতিতে বিশ্বাসী। এগুলো হলো—সরকারি ভাষা নীতি, শিক্ষায় ভাষা নীতি এবং সাধারণ ভাষা নীতি। মৃণাল নাথ উপরি-উক্ত পাঁচজনের দৃষ্টিভঙ্গিতেই 'ভাষা পরিকল্পনা' বিষয়টিকে স্পর্শ করেছেন পূর্ণ যথার্থতায়।

এ-তো গেল একটি আনুক্রমিক আলোচনা। এ ধরনের বর্ণনাত্মক উপস্থাপনায় লেখক যে সকৃতিত্বে পূর্ণ উপলব্ধ হন না তা বলার হয়তো অপেক্ষা রাখে না। পথ একটিই—তা হলো লেখকের গ্রন্থটি আদ্যন্ত পাঠ। সেটি করলেই একজন পাঠক অনুধাবনে সক্ষম হবেন যে লেখক কী কাজটি করেছেন। মৃণাল নাথ বুভুক্ষু পাঠক, অন্তর্ভেদী বিশ্লেষক, যথার্থ উপস্থাপক। লেখকের শ্রমের মূল্যায়ন শুধু উল্লেখপঞ্জিতে উদ্ধৃত গ্রন্থ-প্রবন্ধের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের সন্নিবেশীকরণেই নয় বরং এর অতিরিক্ত কিছু। এই 'অতিরিক্ত কিছু'-তেই তাঁর সার্থকতা। সমাজভাষাবিজ্ঞানের চতুর্প্রাণপুরুষ ফিশম্যান, গামপার্জ, হাইমস, লেবভসহ প্রায় সকল তাত্ত্বিকের তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে এই *ভাষা ও সমাজ* গ্রন্থটিতে। তিনি পড়েছেন গোগ্রাসে। তথ্যের সমর্থনে তত্ত্ব বর্ণনায় সাযুজ্য খুঁজেছেন কখনও নিজের ভাষায়, কখনও ভারতীয় অপরাপর ভাষার উদাহরণ টেনে নিজস্ব চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। ফলে গ্রন্থটি রূঢ় তত্ত্বভারে আকীর্ণ না হয়ে সাবলীল ও পাঠ-আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দুরূহ এবং সূক্ষ্ম আলোচনায়ও তাঁর ব্যবহৃত ভাষা সাবলীল, গতিময়।

যে শাস্ত্রের বয়স এখনও অর্ধশতক হয়নি, তার ধারণাসমূহ সুস্থির না হওয়াই স্বাভাবিক। লেখকের নিম্ন-উদ্ধৃত বক্তব্যের সঙ্গে আমরাও একমত :

> সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ সমাজভাষাবিজ্ঞানের ব্যাপক কাঠামোয় যা অন্তর্গত হতে পারে তার সার্বিক আলোচনা করার প্রয়াস কেউ করেন নি। সুসম্বন্ধ বা অসম্বন্ধভাবে অনেক অনুসন্ধানই প্রকাশিত হয়েছে। সমাজভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রটি নবীন হলেও, তা প্রাপ্তবয়স্কতার পথে, তাই পূর্ণাঙ্গতা আশা করা সমীচীন নয়। শাস্ত্রটি এখনো বিকাশের স্তরে। (পৃ. ১২)

'সার্বিক আলোচনা করার প্রয়াস কেউ করেন নি' বলায় কিন্তু পাঠক ভেবে বসবেন না যে বাংলাভাষী অঞ্চল সম্পর্কে এ মূল্যায়ন। ইউরোপ-আমেরিকা অন্তর্ভুক্ত করেই কিন্তু এ প্রসঙ্গ। যে প্রয়াস কেউ করেননি, তারই প্রয়াস কিন্তু আলোচ্য *ভাষা ও সমাজ*। কৃতিত্ব তো তাঁকে দিতেই হয়।

আলোচনার উপান্তে এসে আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করছি। সেটি পরিভাষা। লেখক যথার্থই বলেছেন :

> সমাজ ও ভাষা বিষয়ক কোনো বই লেখার সব চেয়ে বড়ো বাধা হচ্ছে পরিভাষার সমস্যা। আলোচ্য বই-এ যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে তার অধিকাংশই বাঙলায় আগে আদৌ আলোচিত হয়নি। ... ... সুতরাং বিষয়ের প্রয়োজনে নব নব পরিভাষার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পূর্বসূরিদের অনেক পরিভাষাই গ্রন্থকারের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় নি। আবার ক্ষেত্রবিশেষে কিছু কিছু গ্রহণ করতে দ্বিধা করিনি। (পৃ.৯)

অর্থাৎ এই গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়েই তিনি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধতর করার প্রয়াস পেয়েছেন। পরিভাষা নির্মাণে ঘটে শব্দসৃষ্টি, ফলে তা হয়ে ওঠে ভাষিক সৃজনশীলতার অন্যতম অভিব্যক্তি। পরিভাষা নির্মাণ 'ভাষা পরিকল্পনা'-ভুক্ত 'অবয়ব পরিকল্পনা'-র অংশ। তাই একে স্বাভাবিকভাবেই বলা যেতে পারে ফলিত সমাজভাষাবিজ্ঞানের যথার্থ উপযোগ। এই উপযোগেও তিনি প্রায়শ সার্থক। লেখক ব্যবহৃত কিছু পরিভাষা উদ্ধৃত হলো—যার মাধ্যমে বোঝা যাবে লেখকের সৃজনশীলতা এবং মূলানুগতা :

Acquision— আয়ত্তি, Acronym—শীর্ষনাম, Addressee—সম্ভাসিত, Addressor—সম্ভাষক, Approach—আক্রম, Casual—আপতিক, Communication—সংজ্ঞাপন, Cultivation—পরিকর্ষণ, Destabilize—বিস্থায়ী, Diglossia—দ্বিবাচন, Discourse—সন্দর্ভ, Excellence—প্রকর্ষ, Forms of Speech—বাকরূপ, Frequency—বারংবারতা, Function—নির্বাহন, Horizontal—অনুপ্রস্থ, অনুলম্ব, Idiolect—নিভাষা, Intellectualization—বোধায়ন, Interview—অন্তর্বীক্ষা, Language Management—ভাষা নিয়মন, Lingua Franca—সংযোগ ভাষা, Motivation—প্রেষণা, Particularistic—প্রাতিস্বিকতাবাদী, Pragmatics—বাক্ ব্যবহার, Referential Function —অভিধাগত নির্বাহন, Setting—অনুষঙ্গ, Speech Community—বাক সম্প্রদায়, Speech Reportoire—বাক ভাণ্ডার, Stability—সুস্থিতি, Standardization—মান্যায়ন, Suprasegmental—

অতিভাষিক, Switch—সরণ, System—সংক্রিয়া, Typology—প্রকারতত্ত্ব, Utterence—সংকথন, Variety—পরিবৃত্তি, Verbal Reportoire—কথন ভাণ্ডার প্রভৃতি।

কিন্তু এই 'সৃজনশীলতা এবং মূলানুগতা' কখনও কখনও বহুল প্রচলিত পরিভাষা থেকে তাকে দূরবর্তীও করেছে। Casual (নৈমিত্তিক), Cultivation (চাষ, চর্চা), Frequencey (পৌনঃপুনিকতা), Function (বৃত্তি), Horizontal (আনুভূমিক), Interview (সাক্ষাৎকার), Language Management (ভাষা ব্যবস্থাপনা), System (সংশ্রয়), Utterence (বিবৃতি), Variety (বৈচিত্র্য) প্রভৃতি পরিভাষা নির্মাণের উদাহরণ টানা যেতে পারে। লেখক ১৯৭৯ সালে পি-এইচ ডি অভিসন্দর্ভ রচনা করেছিলেন 'এ সিম্যানটিক স্টাডি অব স্যাংসক্রিট লেক্সিস ইন আরলি বেঙ্গলি' শিরোনামায়। ফলে, তার প্রভাব আমরা লক্ষ করি তার পরিভাষা নির্মাণে। শুধু পরিভাষা নির্মাণ করলেই চলবে না, তাকে পরিচিতির পরিমণ্ডলেও নিয়ে আসতে হবে। মনসুর মুসার মূল্যায়ন প্রাসঙ্গিক :

> পরিভাষা-সমস্যা শুধু নতুন শব্দসৃষ্টির সমস্যা নয়, সৃষ্ট-শব্দকে ব্যবহারকারীর পরিচিতির পরিমণ্ডলে নিয়ে গিয়ে ক্রমে ক্রমে গ্রহণযোগ্য কিংবা সহনীয় করে তোলার সমস্যাও বটে। যা নতুন তা অবশ্যই অপরিচিত, আর যা অপরিচিত তার আবির্ভাবই নতুন। এ-যখন পরিস্থিতি, তখন নতুনকে অপরিচিত বলে প্রত্যাখ্যান করার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এই সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে অবশ্যই নতুনকে পরিচিতের সঙ্গে এসে পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[১৩]

তারপরও আমর বলব, পরিভাষা নির্মাণে তিনি ব্যাপক পরিভ্রমণকারী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর নির্মাণ অতিমাত্রায় সংস্কৃত আকীর্ণতায় দুরূহ হলেও প্রাতিপার্শ্বিকতার বিচারে অযথাযথ নয়। বিষয়টিকে আমরা না হয় সময়ের হাতেই ছেড়ে দিলাম। সময় নিশ্চয়ই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ভাষাবিজ্ঞনের গবেষক-অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী এবং ভাষা-উৎসাহী সাধারণ পাঠক তো বটেই, সেই সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, সাহিত্য, এমনকি প্রত্নবিজ্ঞান উৎসাহীদেরও খোরাক যোগাবে এ গ্রন্থ। কারণ, এতে রয়েছে সমাজভাষিক সূত্র নির্মাণের এমন এক অখণ্ড প্রয়াস যাতে লেখকের কৃতকার্যতা প্রশ্নাতীত।

তথ্যনির্দেশ

১. David Crystal, *The Cambridge Encyclopedia of Language,* 1987, Cambridge University Press, Cambridge, পৃ. ১৪

২. H.A. Gleason Jr., *An Introduction to Descriptive Linguistics,* 1970, Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi, পৃ. ২

৩. ডঃ রামেশ্বর শ', *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,* ১৩৯৯, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ১৭-১৮

৪. Dr. Varshney, *An Introductory Text Book of Linguistics and Phonetics*, 1995, Student Store, Bareilly, পৃ. ২৯৪

৫. মৃণাল নাথ, *সমাজভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা*, ১৯৮৯, বাংলাদেশ ভাষা সমিতি, ঢাকা, পৃ. ২

৬. R.A. Hudson, *Sociolinguistics*, 1980, Cambridge University Press, Cambridge, পৃ. ৫

৭. Peter Tradgill, *Sociolinguistics : An Introduction*, 1974, Penguin Books Ltd., Harmondsworth, England, পৃ. ৩৩-৩৪

৮. 'সমাজভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব পরিচিতিমূলক প্রথম প্রবন্ধ রাজীব হুমায়ুনের সমাজভাষাবিজ্ঞান (১৯৮০) আর প্রথম গ্রন্থ মৃণাল নাথের সমাজভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা (১৯৮৯)'। রাজীব হুমায়ুন, *সমাজভাষাবিজ্ঞান*, ২০০১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৮

৯. মৃণাল নাথ, *ভাষা ও সমাজ*, ১৯৯৯, নয়া উদ্যোগ, কলিকাতা, পৃ. ১১। এর পর এই গ্রন্থ থেকে নেওয়া উদ্ধৃতির পাশে শুধু পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা হবে।

১০. Leonard Bloomfield, *Language*, 1980, Motilal Banarsidass, Delhi, পৃ. ২৯

১১. C.A.Ferguson, `Diglossia', in Pier Paolo Giglioli (Ed.), *Language and Social Context*, 1985, Penguin Books Ltd., Harmondsworth, England, পৃ. ২৩৫-২৩৬

১২. R.A. Hall Jr., 'Pidgins and Creoles as Standard Languages' in J. B. Pride and Janet Holmes (Eds.), *Sociolinguistics*, 1987, Penguin Books Ltd., Harmondsworth, England, পৃ. ১৪২

১৩. মনসুর মুসা, *বাঙলা পরিভাষা : ইতিহাস ও সমস্যা*, ১৯৮৪, বাঙলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, পৃ. ৩-৪

* বর্তমান পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধটি মৃণাল নাথ রচিত *ভাষা ও সমাজ* (নয়া উদ্যোগ, কলিকাতা, ১৯৯৯) গ্রন্থ সম্পর্কে একটি সমীক্ষা।